কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৩ মার্চ, ২০১৮ ২৩:১৮

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর কী লাভ?

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুব বেশি ভাবে না। মূলত শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। প্রায়ই পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন পদ্ধতি পাল্টানো হয়। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনবার প্রশ্ন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। পাঠ্য বই, সিলেবাস, ফলাফল পদ্ধতি এবং খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে কয়েকবার। সাধারণত যেকোনো পরিবর্তন কিংবা সংস্কার সাধন ইতিবাচক লক্ষ্যে হয়ে থাকলেও আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় তা হয় না। শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ধরনের পরিবর্তনের ফলে যদি শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেটা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন বক্তব্যে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে আগামী বছর থেকে পাবলিক পরীক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। একবার বলেছেন পরিবর্তন আনা হবে আবার বলেছেন সহসাই পরিবর্তন হবে না। এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কিংবা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন সেটি দ্রুততম সময়ে নেওয়াই ভালো। অবশ্য সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে কোনো উদ্যোগ কাজে না আসায় পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্তটি কতটুকু যৌক্তিক তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

আমাদের দেশে পরীক্ষা পদ্ধতিতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর কতটুকু পড়ে তা কখনো ভেবে দেখা হয় না। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রশ্নটি থেকেই গেছে। বিশেষ করে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে জিপিএ ৫ পেয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ১ শতাংশ শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি তখন শিক্ষার মানোন্নয়ন বিতর্ক বড় আকারে আমাদের সামনে আসে। ধারণা করা হয়, মেধাবী বিবেচনায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যাটা অপেক্ষাকৃত বেশি। বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পাচ্ছে আবার তুলনামূলক কম মেধাবীরাও জিপিএ ৫ পেয়ে পরীক্ষায় পাস করছে। আর এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায়।

এ দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ১৯৯১ সালে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম আমাদের দেশে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং সিস্টেমে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। পরে একই পদ্ধতি ২০০৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় কার্যকর করা হয়। উল্লেখ্য, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর বছরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারা

দেশে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ৭৬ জন (২০০১)। এরপর ৩২৭ জন পায় ২০০২ সালে। এক হাজার ৩৮৯ জন পায় ২০০৩ সালে। কিন্তু এখন ওই তুলনায় অনেক বেশি জিপিএ ৫ পাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে কয়েক বছর অন্তর পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফলে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক যে আগের তুলনায় কি পরবর্তী সময়ে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়?

একসময় (১৯৯২-৯৫ সাল) এসএসসি পরীক্ষায় নির্দিষ্টসংখ্যক (৫০০ প্রশ্নসংবলিত প্রশ্নব্যাংক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার কারণে শিক্ষার্থীদের ওই প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই ১০০ শতাংশ এমসিকিউ প্রশ্ন কমন পাওয়ার সুযোগ ছিল। এর ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে সহজেই ৫০ নম্বর পেয়ে এবং বাকি ৫০ নম্বরের রচনামূলক পরীক্ষায় কোনো রকমে ১০ পেলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যেত। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ওই সময়ে সহজেই একজন শিক্ষার্থী ভালো ফল করতে পারত। আবার ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এমসিকিউ পরীক্ষায় নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই ১০০ শতাংশ কমন পাওয়ার নিশ্চয়তা তুলে দেওয়া হয়। এমনকি এমসিকিউ ও রচনামূলক পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাসের বিধান করা হয়। পরিবর্তন আসে পদ্ধতিতে এবং এর প্রভাব পড়ে ফলাফলে। ওই সময় ফলাফল বিচারে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে চাকরির ভাইভা বোর্ডে সনদপত্রে প্রাপ্ত নম্বরে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তরা এগিয়ে যায়। আবার তুলনামূলক মেধাবীরা পদ্ধতি পরিবর্তনে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার ফলাফলে পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রভাব যে শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট। বাস্তবিক অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত নতুন পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কাজেই লক্ষ করা যায় যে এসএসসি পরীক্ষায় যখন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয় তখন জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে হঠাৎ করে জিপিএ ৫ এর সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে যায়। আবার ১৯৯২-৯৫ সালে একজন শিক্ষার্থী যতটা সহজভাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, ১৯৯৬ সালে ততটা সহজভাবে প্রথম বিভাগ পায়নি। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যখন একই মেধায় প্রথম বিভাগ কিংবা জিপিএ ৫ পাচ্ছে, পরবর্তী বছর পরীক্ষা পদ্ধতি বা খাতা মূল্যায়নের ধরন পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে একজন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগ কিংবা জিপিএ ৫ পাচ্ছে না অথবা তুলনামূলক অনেক বেশি পেয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে এখন পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস অভিজ্ঞতাতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও মুক্ত নয়। সরকারের উচ্চ মহলের কথায় মনে হচ্ছে কোনোভাবেই প্রশ্ন ফাঁস রোধ করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন ফাঁস রোধ করতে যদি প্রতিবছর পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে শিক্ষায় যে কী পরিমাণ নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে সরকারের যুক্তি হলো, অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হলে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে ভারসাম্য আসবে। এতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে সুফল পাবে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসে ঘটেছে উল্টো ঘটনা। এতে সারা দেশের পরীক্ষাই বিতর্কের মুখে পড়েছে।

একেক সময় একেক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেই বিতর্কের মুখে ফেলা কিংবা শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এসব সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রবণতা খুব বেশি। আর এর প্রভাব গিয়ে পড়ে গোটা শিক্ষা কাঠামোতে। ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল পরিণতিও লক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোমলমতি শিশু থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শিক্ষার্থী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

sultanmahmud.rana@gmail.com

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com